যুগান্তর

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ...৩... কলাম...২.......

কাল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

প্রাথমিকে ডিজিটাল পাঠদান ৯ বছরেও অগ্রগতি নেই

মুসতাক আহমদ

সারা দেশে ৬৫ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৯ হাজার বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর আছে। শতাংশের হিসাবে প্রায় ১৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর থাকলেও এর অর্ধেকের বেশি নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। আবার বাকিগুলোর বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয় না। ৯ বছর আগে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ শুরু করলেও ধীরগতিতে এগোচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ৭৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর আছে বলে সরকারি হিসাবে বলা হচ্ছে। যদিও ওইসব বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে পাঠদানের ব্যাপারে অভিযোগের অন্ত নেই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারিভাবে দেয়া মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বাক্সবন্দি অবস্থায় পড়ে আছে বলে বিভিন্ন পরিদর্শন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

১৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর থাকলেও অধিকাংশ নষ্ট ও বাক্সবন্দি

সরকারি হিসাবে দেশে সাক্ষরতার হার ৭২.৩ শতাংশ

বেসরকারি হিসাবের সঙ্গে তফাৎ ২১ শতাংশ

এ প্রসঙ্গে গণসাক্ষরতা অভিযানের (ক্যাম্প) উপ-পরিচালক কেএম এনামুল হক যুগান্তরকে বলেন, মাল্টিমিডিয়ার প্রধান ব্যবহারকারী শিক্ষক ক্লাসরুমে তা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর জ্ঞান উন্নয়নে সহায়তা করবেন। অপর দিকে কম্পিউটার ল্যাবের ব্যবহারকারী হল শিক্ষার্থীরা। জ্ঞান অর্জনে তারা এটি ব্যবহার করবে। কিন্তু কোনো পক্ষই তা ঠিকমতো করছেন না। বরং সরকারের সরবরাহ করা মাল্টিমিডিয়া সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার নিয়ে নানা প্রশ্ন আছে। কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ল্যাবগুলো খোলা হয় না বলেও জেনেছি। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানের গ্রাজুয়েট তৈরি করতে হলে প্রত্যেক শিক্ষকের একটি করে ল্যাপটপ থাকতে হবে। প্রতিটি স্কুলে একটি করে কম্পিউটার ল্যাব থাকতে হবে। তাহলে শিক্ষায় ডিজিটালের ন্যূনতম ছোঁয়া লাগবে। এজন্য অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, সে অনুযায়ী বিনিয়োগ ও শিক্ষা বাজেট করতে হবে।

এদিকে লেখাপড়া ও পাঠদানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের এমন পরিস্থিতির মধ্যে 'সাক্ষরতা অর্জন করি, ডিজিটাল বিশ্ব গড়ি' শীর্ষক স্লোগান ধারণ করে আগামীকাল শুক্রবার উদযাপিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এ উপলক্ষে বুধবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার সাক্ষরতার নতুন তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশের ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ সাক্ষর। বাকি ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষকে সাক্ষর করতে বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। যদিও সরকারি সাক্ষরতার হারের সঙ্গে বেসরকারি হিসাবের মিল নেই। গত বছরের ডিসেম্বরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান (ক্যাম্পে) এক সমীক্ষা প্রতিবেদন ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

প্রাথমিকে ডিজিটাল পাঠদান ৯ বছরেও অগ্রগতি নেই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশ করে জানায়, দেশে সাক্ষরতার হার ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ। সেই হিসাবে সরকারি তথ্যের সঙ্গে তফাৎ প্রায় ২১ শতাংশ।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) দেয়া তথ্য অনুযায়ী সাক্ষরতার এই হার পাওয়া গেছে। কোন মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে বিবিএস সাক্ষরতার হার নিরূপণ করেছে, তা আমাদের জানা নেই। তবে সমীক্ষার ব্যাপারে বিবিএস সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। সেই তথ্যই আমরা ব্যবহার করি।

বিবিএস সূত্র জানায়, প্রতি বছর দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি হিসাব করা হয়। ২০১৬ সালের শুরুতে ওই কাজের অতিরিক্ত হিসাবে সাক্ষরতা পরিস্থিতি দেখা হয়। তখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'তারা চিঠি লিখতে পারে কিনা'। ওই প্রশ্নের 'হ্যাঁ' 'না' জবাবের ওপর ভিত্তি করে সাক্ষর মানুষ হিসাব করা হয়েছে। কোনো পরীক্ষা নেয়া হয়নি।

এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে গণশিক্ষামন্ত্রী ফিজার বলেন, বিবিএসের তথ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে বিশেষজ্ঞ বা বোদ্ধারা প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। তবে এটা ঠিক, একসময় শুধু 'স্বাক্ষর' করতে পারলেই তাকে 'সাক্ষর' মানুষ বলা হতো। এখন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী লিখতে পারা, পড়তে পারা, অঙ্ক করতে পারা এবং সংবাদপত্র পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারার নাম সাক্ষরতা। কিন্তু এসব পারতে হলে একজন মানুষকে তো পুরোপুরি লেখাপড়া জানতে হয়।

৯ বছর ধরে সাক্ষরতার হার নিয়ে বিতর্ক চলছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে বিবিএস ২০০৮ সালে সর্বশেষ সাক্ষরতার হার নিরূপণ করে। ওই বছর এর হার দাঁড়ায় ৪৮ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১১ সালে ১১-৪৫ বছর বয়সীদের মধ্যে বিবিএস এ ধরনের আরেকটি হিসাব করে বলেছিল, সাক্ষরতার হার ৫৮ দশমিক ০৮ শতাংশ। এরপর সরকারিভাবে প্রকৃত অর্থে সাক্ষরতার হার আর নিরূপণ করা হয়নি। যদিও বিবিএসের হিসাবে ২০১৫ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৬৪ দশমিক ০৬ শতাংশ। এভাবে প্রতি বছর একটি হিসাব দিয়ে থাকে সংস্থাটি। ১৯৭১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ।

বিবিএসের একটি সূত্র জানায়, সাক্ষরতার হার নিরূপণের লক্ষ্যে কয়েক বছর ধরে প্রকল্প প্রস্তাব করা হচ্ছে। সর্বশেষ দেয়া প্রকল্প প্রস্তাবনা পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। নাম প্রকাশ না করে বিবিএসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ওই প্রকল্প পাস হলে সাক্ষরতার প্রকৃত চিত্র বেরিয়ে আসবে।

ডিজিটালের ছোঁয়ায় ধীরগতি : সারা দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৬৫ হাজার ২৭৯টি। এর মধ্যে প্রায় ৯ হাজার স্কুলে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ ল্যাপটপ আছে। তবে এসব স্কুলের মধ্যে তিন হাজার ৯৩০টিতে জাল সফটওয়্যারের ল্যাপটপ দেয়া হয়েছিল। ওইসব ল্যাপটপের প্রায় সব নষ্ট অবস্থায় স্কুলগুলোতে পড়ে আছে বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি আরও ৫০ হাজার স্কুলে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ ল্যাপটপ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথম ধাপে প্রায় ১৩ হাজার মাল্টিমিডিয়া কিনে বিভিন্ন স্কুলে বিতরণ করা হয়েছে। আরও ৩৬ হাজার ৭৪৬টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর কেনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের সঙ্গে যে ৫০ হাজার ল্যাপটপ দেয়া হবে, তা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। দরদাতাদের একজন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ঘাপলার অভিযোগে আদালতে মামলা করেছেন। আরও অভিযোগ, বর্তমানে কোরআইসেভেন মডেলের ল্যাপটপ বাজারে চলছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) কোরআইথ্রি মডেল কিনছে। এর ফলে আগের ৯ হাজারের মতোই কোনো ল্যাপটপ একবার নষ্ট হলে তা পরিত্যক্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কেননা, এরই মধ্যেই ক্রয়ের অপেক্ষাধীন ল্যাপটপগুলোর মডেল পুরনো হয়ে গেছে। এগুলোর পার্টস বাজারে না পাওয়ার আশঙ্কা আছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বলেন, এসব কেনাকাটায় দাতা সংস্থা, বুয়েটসহ দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিরা জড়িত থাকেন। তারা যেটা ভালো মনে করেছেন, সেটাই কেনা হয়েছে। তারপরও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে দূর করা হবে।

এদিকে, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) জানিয়েছে, ২০১৬ সালের হিসাবে প্রায় ৭৬ শতাংশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর আছে। প্রায় ৮৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে আছে কম্পিউটার সুবিধা।

তবে এত বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর থাকলেও সেগুলো শিক্ষার্থীদের কোনো উপকারেই আসছে না। এ তথ্য খোদ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি)। সম্প্রতি মাউশির মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য। এতে বলা হয়েছে, সঠিক মনিটরিংয়ের অভাব, শিক্ষকদের অবহেলা ও অদক্ষতা, ডিজিটাল উপকরণ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক এবং ক্লাসরুম সংকটে মুখ থুবড়ে পড়েছে ডিজিটাল পদ্ধতি মাল্টিমিডিয়া পাঠদান কার্যক্রম। এমন নানা অভিযোগের কারণে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে মাউশি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তদারকি শুরু করেছে। হজে যাওয়ার আগে এ কথা জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান ও শিক্ষা দিতে মাউশির অধীন বাস্তবায়িত ১৪টি প্রকল্পের মধ্যেই কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন, আইসিটি ভবন নির্মাণ ইত্যাদি দিক রাখা হয়েছে।